Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৪ মার্চ, ২০২৩

৪৬ বর্ষ ১১ সংখ্যা ১৩ মার্চ, ২০২৩, সোমবার, ২৮ ফাল্গুন, ১৪২৯

আলুর অভাবী বিক্রি রুখতে রাস্তা অবরোধ করল কৃষকসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১২ মার্চ : রাজ্যের দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল আলু চাষিরা অভাবী বিক্রির কবলে। এক প্যাকেট (৫০ কেজি) আলু উৎপাদন করতে খরচ ৪৭৫ টাকা। ১১ তারিখে আলু মাঠ থেকে বিক্রি হয়েছে ৪৬০ টাকা। সরকার আলু চাষিদের অভাবি বিক্রি আটকাতে ৩০০ টাকা দাম দিয়ে আলু কেনার কথা ঘোষণা করেছে। যদিও আলু কেনার লোককে দেখতে পায়নি একজন চাষি ও। একথা জানান জামালপুরের চাষি সুজিত ডকাল। তিনি এবার ১০ বিঘা আলু চাষ করেছেন। সরকারের এই হাস্যকর আলু কেনার দাবিকে তীব্র নিন্দা করেন। মাঠে আলুর দাম না পাওয়ায় সব আলু স্টোরজাত করেছেন। গরিব আলু চাষি মেমারির কৌসের শেখ জানান তাকে জলের দরে মাঠেতেই বিক্রি করতে হয়। দু বিঘা চাষ করে ২২ হাজার টাকা ক্ষতির মুখে পড়েছি। আমরা যাদের জন্য ফসল ফলাই তাঁদের কিনতে গিয়ে হাতে ছ্যাঁকা লাগে। চাষি দাম পায় না। এটা দেখার কথা কার?

আলু চাষ ও আলু চাষি বাঁচাও কমিটির উদ্যোগে ১০০০ টাকা কুইন্টাল সরকারকে কেনার দাবিতে আলু ফেলে, টায়ার জ্বালিয়ে আমড়া-তে এন.এইচ-২ জাতীয় সড়ক অবরোধ করে হাজার হাজার চাষি। তাদের আরও দাবি, চাষিদের জন্য স্টোরে সংরক্ষণ অগ্রাধিকার দিতে হবে,

—এরপর চারের পাতায়

দামোদর বাঁচানোর দাবিতে কনভেনশন আসানসোলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ৫ মার্চ : রাঢ় বাংলার প্রাণ, দামোদর বাঁচান—এই ডাক দিয়ে গত ২৮ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পশ্চিম বর্ধমান জেলা-কনভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের আসানসোল বিজ্ঞান কেন্দ্রের ডাকে আসানসোল বার লাইব্রেরি হলে একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন জেলা সম্পাদক কল্লোল ঘোষ। প্রস্তাবটি উপস্থাপন করেন সম্পাদিকা ডঃ স্বপ্না চট্টরাজ। লেখিকা জয়া মিত্র বলেন নদীর বানের মতো

—এরপর চারের পাতায়

ত্রিপুরায় ভোটপরবর্তী সিপিআই(এম) কর্মীদের উপর প্রাণঘাতী হামলার প্রতিবাদে বর্ধমানে সিপিআই(এম)-এর মিছিল।

সাহসী ধর্মঘটে সরকারি কর্মচারীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১১ মার্চ : সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ডাকা ১০ মার্চ রাজ্যজোড়া কর্মচারী ধর্মঘট নিয়ে রাস্তায় দু'পক্ষই। বেলা ১০টা থেকে বর্ধমান ট্রেজারির গেট, প্রশাসনিক ভবন, স্কুল বোর্ড ও প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সামনে পিকেটিং শুরু করেন ধর্মঘটীরা। তাঁরা ঢোকার মুখে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন। যদিও কাউকে বাধা দেবেন না বলেও জানান তাঁরা। অপরদিকে, রাজ্য সরকারের সমর্থক ফেডারেশনের নেতারাও অফিসগুলির সামনে যান। যাঁরা অফিসে আসছেন তাঁরা যাতে বাধা না পান তা দেখেন তাঁরা। এর মধ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সামনে ধর্মঘটীরা ব্যানার লাগিয়ে পিকেটিং করেন। ধর্মঘটের বিরোধীরা এসে গেট খুলে দিতে বললে তাঁরা গেট খুলে দেন। জামালপুরে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ডাকা রাজ্যজোড়া কর্মচারী ধর্মঘটে বেশ ভালো সাড়া পড়েছে।

ছাত্রদের উপর হামলার প্রতিবাদ জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ মার্চ : গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও রাজ্য সরকার চিহ্নিত ৮০০০-এর ওপর সরকারি বিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে ফেলার চক্রান্তের বিরুদ্ধে এস.এফ.আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বিধানসভা অভিযানে শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদে মিছিল, প্রতিবাদ জেলা জুড়ে। এদিন বর্ধমানে সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক অর্নিবাণ রায়চৌধুরী ও অন্যান্য ছাত্র নেতৃত্ব। সভা শেষে মিছিল করা হয়। মিছিলে দাবি ওঠে বর্ধমান শহরের ক্যাম্পাসগুলিতে অবিলম্বে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করতে হবে এবং ছাত্র-বিরোধী দাঙ্গাবাজের নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল করতে হবে। সংগঠনের পূর্বস্থলী-১ লোকাল কমিটির উদ্যোগে সমুদ্রগড় স্টেশন বাজারে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কুশপুতুল দাহ করা হয়। এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি প্রবীর ভৌমিক, নীলবাধব পাল প্রমুখ।

কোন ক্ষমতাবতী নেত্রী নন, জনগণই তৈরি করেছেন আস্ত একটি রেলস্টেশন (৫)

তপোময় ঘোষ

হ্যাঁ, না, কোন ক্ষমতাবতী রেলমন্ত্রীও পারেননি, বীরভূমের নানুরে রেলস্টেশন তৈরি করে দিতে। তিনি শুধু পেরেছিলেন ঘোষণা করতে। হ্যাঁ তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ঘোষণা করেছিলেন 'নানুর মডেল স্টেশন হবে'। কিন্তু তখন ওনার বোধহয় জানাই ছিল না যে নানুর দিয়ে কোনো রেলপথই যায়নি অথবা জেনেও মিথ্যা বলেছিলেন। কিন্তু না কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতাবান নেতা বা ক্ষমতাবতী নেত্রী নন, সেরেফ জনগণই একটা রেলস্টেশন তৈরি করে নিয়েছিলেন তাদের সুবিধামত জায়গায়। হ্যাঁ, ১৯৭৪ সালে পূর্ব রেলের হাওড়া আজিমগঞ্জ লাইনের কাটোয়া স্টেশনের উত্তর দিকে পরবর্তী স্টেশন ছিল গঙ্গাটিকুরি যার দূরত্ব কাটোয়া জংশন স্টেশন থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার, মাঝে অন্তত ১৫-২০ খানা গ্রাম। এইসব গ্রামগুলির মানুষদের রেল যাতায়াতের মাধ্যম ছিল সুদূর এই কাটোয়া জংশন স্টেশন অথবা গঙ্গাটিকুরি স্টেশন। গঙ্গাটিকুরি স্টেশন যাওয়ার পাশে একটি ছোট্ট নদী। কোনো ব্রিজ নেই তাই বর্ষার ভরা নদীতে পারাপার করে গঙ্গাটিকুরি স্টেশনে গিয়ে বড় লাইন বা ব্রডগেজের ট্রেন ধরাই ছিল মুশকিল। এ ব্যবস্থা ছিল দীর্ঘদিনের। কিন্তু ১৯৭৪ সালে এলাকায় কিছু ছাত্র যুব যারা এই ব্যবস্থা মেনে নিতে পারছিল না। কারণ এদের অনেকেই তখন

উচ্চশিক্ষার জন্য স্থানীয় কাটোয়া কলেজে পড়তে যেতে চাইছে। মধ্যমেধার এইসব সাধারণ ছাত্ররা সেখানে বেশিরভাগই বাণিজ্য বা কমার্স বিভাগের ভর্তি হত। কিন্তু সেই সময় এই কাটোয়া কলেজের বাণিজ্য বিভাগ ছিল নৈশকালীন বা নাইট শিফটে। সুতরাং ওইসব দূরতম গ্রামের ছাত্রদের সেই রাত্রি ৯টার গাড়িতে ফিরতে হতো। প্রথমে গঙ্গাটিকুরি স্টেশনে নেমে ১০-১৫ কিমি হেঁটে হেঁটে তাদের নিজ নিজ গ্রামের বাড়ি বাড়ি পৌঁছাতে হতো। তাই বাধ্য হয়ে তারা কখনো কখনো দুই স্টেশনের মোটামুটি মাঝখানে শিবলুন অম্বলগ্রামের মাঝের একটি জায়গায় প্রায় নিয়মিত চেন টেনে গাড়ি থামিয়ে নেমে যেত। ছাত্রদের দলবদ্ধ এই অপকর্ম দেখেও গার্ড বা ড্রাইভার সাহেবরাও কিছু উচ্চবাচ্য করতে সাহস পেত না। পরে এই গাড়ি দাঁড় করানোর মাত্রা বাড়তে থাকলো।

—এরপর চারের পাতায়

বাঁধ রক্ষাকারী মানুষদের উচ্ছেদ করতে চাইছে শাসকেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১১ মার্চ : উচ্ছেদ করে প্রমোটারের হাতে জমি তুলে দেওয়ার চক্রান্তের প্রতিবাদে ৬ মার্চ বর্ধমান, ২ ব্লকের বড়শুলে বিক্ষোভ ও মিছিল করেন চাষিরা। উল্লেখ্য, বড়শুল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দক্ষিণ গোপালপুর মৌজার প্রায় ৩৬ বিঘা জমিতে ১৯৫৩ সাল থেকে চাষাবাদ চালিয়ে আসছেন এলাকার গরিব মানুষজন। দীর্ঘদিন ধরে ৩০টি পরিবার এই জমিতে চাষ করছেন। ১৯৫০ সালে বন্যার সময় বাঁধ রক্ষার অবদানের পুরস্কারস্বরূপ এই পরিবারগুলির পিতৃপুরুষদের এই জমি উপযুক্ত করে চাষাবাদ করার অনুমতি দেন তদানীন্তন বিডিও জগন্নাথ সান্যাল। দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে তাঁরা সরকারকে সেই জমির খাজনা দিয়ে এসেছেন। এছাড়াও কৃষিজমির পাশে মিলের মাঠে সরকারি জমিতে প্রায় ৩০টি পরিবার ৪০-৫০ বছর ধরে বসবাস করছে। এই মুহূর্তে তৃণমূল সরকার পাশের বসতবাড়ি সহ চাষিদের জমি (মোট পরিমাণ প্রায় ৫০ বিঘা) জলের দরে এক প্রোমোটারি সংস্থাকে বিক্রি করে দিয়েছে। তারই প্রতিবাদে এবং কৃষিজমি বাঁচানোর লক্ষ্যে সারা ভারত কৃষকসভা ও সারাভারত খেতমজুর ইউনিয়নের নেতৃত্বে এদিন এই মিছিল বড়শুল মিলগেট বাজারে প্রদক্ষিণ করে কলতলা মোড়ে শেষ হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা জহর দত্ত।

নতুন চিঠি

১৩ মার্চ, ২০২৩

১০ মার্চ—লালকার্ড

১০ মার্চ ২০২৩—এ রাজ্যের মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা, যাদের শ্রমের ওপর নির্ভর করেই সরকার তার পরিকল্পনা রূপায়ণ করে ও ক্রেডিট নেয়, ওইদিন সরকারকে লালকার্ড দেখাল। কেন্দ্রীয় কর্মীরা যেখানে মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা সামলানোর জন্য ৩৯ শতাংশ মহার্ঘ্যভাতা পায়, এ রাজ্যে কর্মচারীরা পায় মাত্র ৩ শতাংশ। 'ঘেউ ঘেউ করবেন না' বলেও অসন্তোষ কমাতে মার্চ মাস থেকে ৩ শতাংশ বর্ধিতে ডিএ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে রাজ্য সরকার। তবু পার্থক্য ৩৩ শতাংশ। এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে অগণিত শ্রমজীবী মানুষকে সামিল করে শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা ও দমনমূলক নির্দেশনামা অগ্রাহ্য করে ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন সরকারি কর্মী, শিক্ষক, পৌরকর্মী সমেত বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ। বহু অফিসে দরজা খোলার লোক পাওয়া যায়নি। উপস্থিতি বাড়িয়ে দেখাতে চার চারবার হাজিরা নিতে গলদঘর্ম হয়েছেন আধিকারিকরা। সরকারি হুমকি তোয়াক্কা না করে ধর্মঘটে বিপুল সংখ্যক কর্মীর অংশগ্রহণ শাসকবিরোধী ক্ষোভের স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণ, একথা বলাই বাহুল্য। অথচ দেখা যাচ্ছে যিনি নির্দেশনামা জারি করেছেন তিনি কেন্দ্রের হারে ৩৯ শতাংশ ডি.এ ভোগ করেন।

নানা মিথ্যা তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, মুণ্ডু কেটে নেবার কথা বলে নাটক করে, সরকারি কর্মচারীদের হকের দাবিকে 'পাপ' বলে, এমনকী তাদের স্বার্থরক্ষা 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া' ইত্যাদি বিভাজনমূলক কথা বলে সরকার এই ধর্মঘট রোখার চেষ্টা করেছে। সবজান্তা ভাইপো শ্রমিকের অধিকার অর্জনের লড়াইকে 'কর্মনাশা, ধর্মনাশা বনধ' বলে হেয় করেছেন—ভুলে গেছেন বিরোধী নেত্রী হিসেবে তাঁর দলনেত্রী বনধ-ডাকায় প্রায় সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন। তাছাড়া কারণে অকারণে ছুটি দিয়ে কর্মদিবস নষ্ট করার বিশ্বরেকর্ড যিনি করে চলেছেন, তাঁর রাজ্যে ধর্মঘটকে 'কর্মনাশা' বলার নৈতিক অধিকার কারুর থাকে কি? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শয়তানি প্রচারে এই সফল ধর্মঘট মহার্ঘভাতার জন্য লড়াই বলে উপস্থাপিত হলেও ধর্মঘট শুধু ডিএ-র দাবিতে ডাকা হয়নি। লক্ষ লক্ষ শূন্যপদে নিয়োগ ও চুক্তিশ্রমিকদের স্থায়ীকরণের নায্য দাবিও ছিল। তাই ভ্রাতৃপ্রতিম শ্রমিক সংগঠনগুলিও ধর্মঘটকে সমর্থন করে ও এটি অভূতপূর্ব সাফল্য পায়। রাজ্য সরকারের উচিত গোঁয়ার্তুমি ছেড়ে কান খুলে সরকারি কর্মীদের প্রধান দাবিগুলি কী তা শোনা ও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া। রেফারির লালকার্ড বেরিয়ে গেছে, আর আস্তিন গুটিয়ে লাভ নেই।

ছাত্র আন্দোলনের নিরিখেও ১০ মার্চের সংগ্রামী সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা ব্যবস্থায় সুরক্ষা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার ও দুর্নীতিবাজদের ক্ষমতাচ্যুত করার সংকল্প নিয়ে বিধানসভা অভিযানের ডাক দিয়েছিল এসএফআই। কলকাতার রাজপথে মিছিলের আহ্বানও ছিল। আগের মতোই স্বৈরাচারী শাসক মিছিল আটকাতে হাওড়া-শিয়ালদায় সেপাই-সান্ত্রীর ঢালাও ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু পুলিশ আটকাতে পারেনি স্পর্ধিত যৌবনকে। পুলিশের দমনপীড়নকে ভ্রূক্ষেপ না করে বিধানসভার গেটের ওপর চড়ে নিজেদের শক্তির প্রমাণ দিল ছাত্ররা। মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পারছেন, শুধু বাগাড়ম্বর আর মুষ্টিভিক্ষায় আর কাজ হচ্ছে না। সাগরদিঘি হলুদ কার্ড দেখিয়েছিল, ১০ মার্চ দেখাল লালকার্ড। এখন তিনি কতদিন খেলতে পারেন সেটাই দেখার।

অংকনের বার্ষিক প্রদর্শনী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমান শহরের সাংস্কৃতিক ক্যালেন্ডার একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে বর্ধমানের নিজস্ব চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর্য ভাস্করদের সংগঠন অংকনের বার্ষিক চিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী। শহরে একটি নিজস্ব আর্ট গ্যালারির অভাব চিরকালই আছে। একসময় অংকন সংস্কৃতি লোকমঞ্চ, কৃষ্ণসায়র পার্কের মেলা, সৃজনী আর্ট গ্যালারি ও জেলা গ্রন্থাগারে প্রদর্শনী করেছে। বিগত ২০১১ সাল থেকে বাৎসরিক প্রদর্শনীর ঠিকানা হয়েছে খোসবাগান জাতীয় সংঘ ভলিবল মাঠে। বর্তমান বার্ষিক প্রদর্শনীর (৬-৯ মার্চ) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসডিও কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল, গাছ মাস্টার শিক্ষারত্ন অরূপ চৌধুরী, শিল্পানুরাগী শিল্পোদ্যোগী গৌতম তা, সভাপতি ক্ষীরোদবিহারী ঘোষ, বরিষ্ঠ শিল্পী শিবশংকর কুণ্ডু। মোট আঠাশ জন চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর তাঁদের কাজ প্রদর্শন করেন। আগ্রহী দর্শকের সঙ্গে শিল্পীদের ভাববিনিময়ের সুযোগ প্রদর্শনীকে প্রাণবন্ত করে তোলে। প্রদর্শনীর ক্যাটালগটিও বরাবরের মতই একটি সুন্দর সংগ্রহযোগ্য প্রকাশনা। অল্পমূল্যে শিল্পকর্মের নমুনা ও বই সংগ্রহের জন্য প্রদর্শিত হয়।

প্রভাবউদ্যোগ

শান্তনু কুমার ঘোষ

সামাজিক ও সংহতি অর্থনীতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত সংগঠন সমগ্র বিশ্বে বিশেষভাবে পরিচিত, 'প্রভাব উদ্যোগ' তাদের মধ্যে অন্যতম। ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের প্রভাব (impact) সমাজের উপর পড়বে এটাই স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও, আলাদা করে এমন উদ্যোগ গড়ে ওঠার পিছনে যে সমস্ত কারণ বর্তমান সেগুলির উৎস হলো ভারসাম্যহীন সামাজিক পরিস্থিতি। এক কথায় বলা যেতে পারে, আর্থিক ও সামাজিক অসাম্য এই ধরনের বিশেষ উদ্যোগের মূলে। বিনিয়োগের সাধারণ উদ্দেশ্য হলো মুনাফা (financial profit) অর্জন করা। অথচ সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার তাগিদে আর্থিক বিনিয়োগের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সামাজিক লাভ (social return) বা সুবিধা অর্জন—যা সাধারণ ভাবে কোনো ব্যবসায়ী উদ্যোগের বিবেচনার বিষয় হতে পারে না। সুতরাং, প্রভাব উদ্যোগ গড়ে তোলার পূর্বশর্ত হলো 'প্রভাব বিনিয়োগ' —যার মূল উদ্দেশ্য হবে সামাজিক লাভকে সুনিশ্চিত করা এবং তারপরে সম্ভব হলে আর্থিক লাভের কথা বিবেচনা করা। তাহলে এই ধরনের সামাজিক প্রয়োজনে বিনিয়োগযোগ্য অর্থ আসবে কিভাবে? বর্তমান প্রবন্ধটি প্রভাব বিনিয়োগ ধারণার উদ্ভব থেকে বর্তমান কালের 'প্রভাব উদ্যোগ' নামে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যবসায়িক রূপে পরিণত হওয়ার যে যাত্রাপথ, তার উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

প্রভাব বিনিয়োগের ধারণাটি 'সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ বিনিয়োগের' (Socially Responsible Investment) ধারণার অন্তর্গত একটি রূপ হিসাবে বিবেচনা করা হয়—যার ভিত্তি হলো মানুষের নৈতিকতা বোধ। পক্ষান্তরে, মানুষের নৈতিকতাবোধ আবার 'সামাজিক ন্যায় ও অন্যায়' সম্পর্কিত ধারণার অনুসারী। সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে গড়ে ওঠে এই ধারণা। সম্ভবত তাকে ভিত্তি করেই, সমাজের উপর মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপজনিত 'প্রভাব' সম্পর্কে বিশ্লেষণ প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে।

মানবসভ্যতা হলো বিবিধ ভাষা, ধর্ম, বর্ণ ও বোধের একটি সমন্বিত ও বহমান রূপ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, মানুষে-মানুষে স্থানগত এবং বস্তুগত অপার বৈচিত্র্যের মাঝেও, আচরণগত সামঞ্জস্য বহু প্রাচীনকাল থেকেই পরিলক্ষিত হয়। গবেষকদের মতে, মানুষের আচরণগত নৈতিকতা শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে মূলত ধর্মভাবনার হাত ধরে। মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় সামাজিক ন্যায় সম্পর্কিত সূত্রসমূহের। উদাহরণস্বরূপ, মোজেসের (Moses) লেখা (১৫০০ -১৩০০ কমন যুগের আগে, B.C.E.) ধর্মগ্রন্থ 'তাওরাত' থেকে ইহুদিদের আইন (Jewish law) সম্পর্কে জানা যায়। এই ধর্মীয় রীতি অনুসারে 'ন্যায় ও সাম্যের' নীতি মেনে চলাই হবে মানুষের ধর্ম (Tzedek), যা ব্যক্তিজীবন, রাষ্ট্র পরিচালনা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সমান ভাবে প্রযোজ্য। উল্লেখিত নিয়মের মূল কথা হলো, ব্যক্তির কাজের সম্ভাব্য পরিণতি হিসাবে তাৎক্ষণিক কিংবা সুদূরপ্রসারী সামাজিক ক্ষতি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত বা সামাজিক পরিসরে যে কোনো অর্থনৈতিক কাজের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বর্জনীয়। যেটুকু জানা যায়, একইভাবে বিশ্বের প্রায় সমস্ত ধর্মে বর্ণিত অনুশাসনের মূল সুরটি হলো ব্যক্তিগত লাভের উর্ধ্বে সামাজিক ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করা। এমনকি বয়সে অপেক্ষাকৃত নবীন (৬০৯-৬৩২ কমনযুগ, CE) ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী সমস্ত ধরনের আর্থিক বিনিয়োগ শরিয়ত আদর্শ অনুযায়ী সংঘটিত হওয়া উচিত। নবীন এই বিনিয়োগ ধারাটি বর্তমানে ইসলামিক অর্থায়ন (Islamic finance) নামে পরিচিত এবং কমপক্ষে বিশ্বের ৫৬টি মুসলিম দেশে বাস্তবে ক্রিয়াশীল। ভারতবর্ষেও এই ধারণার অনুসারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান আছে।

প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে (evidence based)এ কথা বলা যায় যে, 'সামাজিক ভাবে দায়বদ্ধ বিনিয়োগের' ধারণার সূত্রপাত ঘটে মূলত অষ্টাদশ শতকে, দাসপ্রথা সহ সামাজিকভাবে ক্ষতিকারক ব্যবস্থা নানান অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ

পঞ্চবিংশ পর্ব

পদক্ষেপের ফল হিসাবে। এই প্রসঙ্গেও প্রাথমিক পদক্ষেপ যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলো প্রটেস্টান্ট ধর্ম (Methodist—John Wesley-র অনুগামী) সম্প্রদায়ের মানুষরা। সুতরাং, ইহুদি ধর্ম মোতাবেক 'ন্যায় ও সাম্যের' নীতিসমূহকে শুরু হিসাবে মান্যতা দিলে, এমন সিদ্ধান্ত করা অনুচিত হবে না যে- সমাজের উপর ব্যবসা বা অর্থনৈতিক কার্যাবলীর প্রভাব সম্পর্কিত নৈতিক ধারণার উদ্ভব ঘটে ধর্মীয় অনুশাসনের হাত ধরে এবং যার সূত্রপাত হয় কমবেশি ৩৭০০ বৎসর আগে।

পরবর্তী কালে, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ-এই দুই শতক জুড়ে নানান ধর্মীয় অনুশাসনের ছত্রছায়ায় থেকেই সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এই বিনিয়োগ ধারণার প্রয়োগ চলার পর ১৯২৮ সালে আমেরিকার বোস্টনে Pioneer Fund নামে একটি সার্বজনীন অর্থভাণ্ডার সৃষ্টি হয়। এই আধুনিক বিনিয়োগ ভাণ্ডারটিকে পরিচালনার জন্য উদ্যোক্তারা 'সামাজিক প্রভাব'-কে কৌশল/ভিত্তি হিসাবে ঘোষণা করেন। বলা যেতে পারে যে, এরই মাধ্যমে শুরু হলো আধুনিক কালের 'সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ বিনিয়োগের' যাত্রা।

অর্থায়ন সম্পর্কিত আচরণ (behaviour) বর্তমান কালে একটি সুপরিচিত আলোচ্য বিষয়। আলোচনার এই স্তরে বিনিয়োগকারী ব্যক্তির আচরণ এবং সামাজিক উদ্যোগ (social action); এই দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্রটি অনুধাবন করা জরুরি প্রধানত দুটি কারণে; ১) অর্থ বিনিয়োগকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি এবং সমাজের ভূমিকার বিশ্লেষণ; এবং ২) সামাজিক ও সংহতি অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে সেই ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনা আপাতত এই বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রভাব বিনিয়োগ সম্পর্কিত অবশিষ্ট আলোচনা পরের পর্বের জন্য নির্ধারিত থাকলো।

অর্থ বিনিয়োগের কার্যকারিতা সম্পর্কিত বিশ্লেষণ 'আর্থিক যৌক্তিকতা' (economic rationality) তত্ত্বের ভিত্তিতে করা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে, বিনিয়োগকারী সাধারণত কম ঝুঁকি ও বেশি উপার্জনের প্রতি আগ্রহী হন। স্বভাবতই, আর্থিক উপার্জনের পরিবর্তে সামাজিক লাভের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিনিয়োগ করা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। তাহলে সামাজিক প্রভাবের ধারণার উপর ভিত্তি করে বিনিয়োগ স্মরণাতীত কাল থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে কী করে? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য সমাজবিদ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পাঠ 'সামাজিক উদ্যোগ বা social action তত্ত্বের পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

ম্যাক্সওয়েবার social action তত্ত্বের উদ্ভাবক। তাঁর মতে মানুষের আচরণের সমন্বয়েই সমাজ তথা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি। এবং মানুষই এই সৃষ্টিকে অর্থবহ করে তোলে। তাই আমাদের আলোচিত প্রভাব বিনিয়োগ সহ যে কোনো সামাজিক উদ্যোগের পিছনে থাকে সমবেত ব্যক্তিমানুষের প্রয়াস।

অন্যদিকে সমাজের কাঠামোগত (structural) বিশ্লেষণের ভিত্তি হলো প্রতিষ্ঠান। এই তত্ত্ব অনুসারে সমাজ হলো প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বিত রূপ এবং মানুষের আচরণ ও তার যথার্থতা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান দ্বারাই নির্ধারিত হয়। সুতরাং, ব্যক্তির বিনিয়োগ সম্বন্ধীয় আচরণও সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল।

কাঠামোগত বিশ্লেষণ পদ্ধতির অন্যতম একটি ধারা হলো- 'ক্রিয়ামূলক/ কার্যকারিতা তত্ব' (functionalism) mile Durkheim– Talcott Parsons Robert Merton সহ বিভিন্ন গবেষক এই তত্ত্বের প্রবক্তা। জনগণের মধ্যে (ব্যক্তিসমূহের) আচরণগত নিয়ম ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত সহমতই (consensus) সমাজকে ক্রিয়াশীল করে তোলার প্রয়োজনীয় উপাদান। Durkheim (১৮৯২ ও ১৮৯৭)-এর ধারণা অনুসারে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রক্ষার উপযোগী চারটি উপাদান হলো—১) সামাজিক সংহতি (solidarity) 2) সামাজিক সহমত (consensus); ৩) অনাচার (anomie); এবং ৪) ইতিবাচকতা (positivism)। লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে anomie বা অনাচার সমাজে ক্ষতিকারক পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার মূলে; অতএব এর বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকা সমাজের পক্ষে জরুরি। তবে, Durkheim-এর মতে কিঞ্চিত পরিমাণ অনাচারের উপস্থিতি সামাজিক সংহতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সংহতি অর্থনীতির (১৯৩৭) ধারণাটি সম্ভবত Durkheim প্রস্তাবিত সামাজিক সংহতি সংক্রান্ত ধারণার অনুসারী।

কাঠামোগত বিশ্লেষণ পদ্ধতির অন্যতম বহুল চর্চিত তত্ত্বটির নাম হলো মার্কসবাদ। এই তত্ত্ব অনুসারে অর্থনীতিই হলো একটি সমাজের প্রধান ভিত্তি (base), যার উপর নির্ভরশীল সমাজের নানান প্রাতিষ্ঠান (উপরি কাঠামো, superstructure)। ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের দ্বারা। যেহেতু উপরিকাঠামো সততই নির্ভরশীল ভিত্তির উপর, তাই অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ যার হাতে থাকে, সমাজের নিয়ন্ত্রণও তারই হাতে থাকবে এমনটাই স্বাভাবিক। সুতরাং, অর্থনীতির নিয়ন্ত্রকের নীতি মেনেই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি যথা—সরকার, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং এমনকি পরিবার যে মূল্যবোধের পুনরুৎপাদন করে তা সবই অর্থনীতির নিয়ন্ত্রকের মূল্যবোধের অনুসারী। এই নিয়ন্ত্রণ থেকে আপাত মুক্তির পথ হিসাবেই হয়তো সামাজিক ও সংহতি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টির প্রয়াস। এবং সম্ভবত, তদনুসারেই ধনতান্ত্রিক তথা মুক্ত বাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও 'প্রভাব বিনিয়োগ' সংক্রান্ত ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে 'প্রভাব উদ্যোগ' সৃষ্টির মাধ্যমে কিছুটা হলেও স্বাধীনতাকামী মানুষের স্বাধিকার অর্জনের চেষ্টা বর্তমানে পরিলক্ষিত হয়।

1 https://www.investopedia.com/news/history-impact-investing/

2 https://makomisrael.org/wp-content/uploads/2015/02/Pages_from_TEN_part_1_web-28.pdf

3 Dr. Faran Ahmad Qadri, "INTEREST IS CONSIDERED AS SIN NEVERTHELESS COMMERCIAL BANKING RELIANT ON IT: A DETAILED STUDY IN THE CONTEXT OF MAJOR RELIGIONS IN THE WORLD", International Journal of Business and Management Review, Vol.6, No.5, pp.28-40, June 2018.

4 https://www.studysmarter.co.uk/explanations/social-studies/theories-and-methods/social-action-theory/

5 https://www.studysmarter.co.uk/explanations/social-studies/theories-and-methods/functionalism/

শিক্ষাক্ষেত্র : সূচির শর্বরী—বর্ধমান তমসা

সুকৃতি ঘোষাল

হঠাৎই হাতে এক ছোট্ট ভিডিও এলো—বিষয় চারজনের মধ্যে কে বড় তা নিয়ে পরীক্ষা। দুজন পুরুষ দুই মহিলা, তাদের একজন প্রবীণা, চেয়ারে বসে। মধ্যবয়সী তিনজনের পরিচয়জ্ঞাপক ফলক সামনের টেবিলে—যা থেকে বোঝা যায় একজন জজ, একজন ডাক্তার, একজন ক্যাপ্টেন। শুধু বয়স্কার পরিচয়জ্ঞাপক ফলক নেই। পরীক্ষার্থীরা নিজের ধারণা অনুযায়ী কেউ জজ, কেউ ডাক্তার, কেউ সামরিক অফিসারকে বড় বলে। পরে তারা জানতে পারে প্রবীণা হলেন শিক্ষিকা, বাকি তিনজন তাঁর হাতে তৈরি। শিক্ষকের পরিচয়জ্ঞাপক পদবি (ডাক্তারের যেমন Dr.) থাকা উচিত এ দাবি প্রচারের উদ্দেশ্যে ভিডিওটি বানানো হলেও এর মধ্যে এক গভীর সত্য নিহিত আছে। যা সকলে জানি কিন্তু মনে রাখি না সেই সত্য হলো, শিক্ষকতা সাধারণ পেশা নয়। শিক্ষক নিজের অজান্তেই জ্ঞানাঙ্কুর রোপণ করেন, যে অঙ্কুর মহীরুহ হয়ে সমাজকে ছায়া দেয়, ফল দেয়, তার কার্বন গ্যাস শোষণ করে বাতাসকে নির্মল করে। বিদ্যাঙ্গন সযত্নে রক্ষা করা তাই রাষ্ট্রচালকদের পবিত্র কর্তব্য হওয়া উচিত। কিন্তু 'যত বেশি জানে, তত কম মানে' যেখানে মূলমন্ত্র, অবহেলা এবং অন্তর্ঘাতই সরকারি নীতিতে প্রকট হবে এটাই স্বাভাবিক। তেমনটাই পরিলক্ষিত হচ্ছে এ রাজ্যে বিগত এক দশকের বেশি সময় ধরে।

শিক্ষায় কেন্দ্র বা রাজ্য কার দায় বেশি এবং কতটা বেশি, শিক্ষাক্ষেত্র সরকারি না বেসরকারি হাতে থাকা উচিত এবং কেন, জ্ঞানে না দক্ষতা—শিক্ষায় জোর কোথায় দেওয়া উচিত, শিক্ষার সাফল্য শিক্ষার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধিতে না গুণগত উৎকর্ষ কিসের ভিত্তিতে মাপা উচিত, শিক্ষায় অগ্রাধিকার প্রাথমিক স্তরে, মধ্যস্তরে না উচ্চস্তরে কোথায় থাকবে—এসব নিয়ে বিতর্ক আছে, থাকবে। এসব বিষয়ে প্রবেশ এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। তবু শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে যা চলছে তা যে ঠিক নয়, তা বুঝতে সরকার-বিরোধী অবস্থানও নিতে হয় না।

প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবস্থা শোচনীয়। সরকারপোষিত স্কুল ছাড়ার ধুম পড়েছে। এটা কোনো অপপ্রচার নয়। সাম্প্রতিক এক তথ্যে জানা গেল ৬৮৪৫ প্রাথমিক স্কুল এবং ১৩৬২ উচ্চপ্রাথমিক স্কুল বন্ধ হতে চলেছে, স্রেফ ৩০-এর কম পড়ুয়া থাকার কারণে। এই স্কুল বন্ধ মানে, যদি স্কুল-প্রতি তিনজন শিক্ষক ধরি ৮২০৭x৩=২৪,৬২১ জনের কর্মসংকোচন। যাঁরা কাজ করছেন তাঁরা হয়তো কর্মচ্যুত হবেন না, বদলি হবেন। কিন্তু যেটা ঘটবে, নিম্ন আয়ের মানুষও ছেলে-মেয়েকে অ-অ-ক-খ বা তার বদলে a-b-c-d শেখানোর জন্য বেসরকারি স্কুলে পাঠাতে বাধ্য হবে এবং সে ব্যয় তার সামান্য আয় থেকেই সংকুলান করতে হবে। না পারলে হবে স্কুলছুট। আরো যেটা মারাত্মক, শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিয়ে স্কুলের থাকা না-থাকা নির্ণয় করার যুক্তিটাই ভুল। স্কুলটির অবস্থান এখানে সর্বাগ্রে বিবেচ্য। কলকাতায় বা ছোট শহরে একটি স্কুল বন্ধ হলে বিকল্প স্কুল পাওয়া যাবে। কিন্তু দার্জিলিং বা কালিম্পং-এ বা জঙ্গলমহলে এমন প্রত্যন্ত গ্রাম থাকতে পারে যার বাসিন্দার সংখ্যা মেরেকেটে দেড়শো। সেখানে স্কুল পড়ুয়া ধরা যাক ১৫। বেসরকারি ক্ষেত্র লাভ পাবে না বলে সেখানে যাবে না। তাহলে সেখানকার পড়ুয়াদের কী হবে? নির্বাচন কমিশন কিন্তু ১ জন ভোটার থাকলেও হিমাচলের দূর গ্রামে ভোট নিতে টিম পাঠায়। অর্থাৎ ভোটের গুরুত্ব শিক্ষার থেকে বেশি। একটা সমাধান হতে পারে, নিকটস্থ কোনো বোর্ডিং স্কুলে এদের পাঠানোর ব্যবস্থা করা। কিন্তু সে ভাবনা ভাবার সময় কই শিক্ষামন্ত্রকের? তারা 'নন-ভয়েবল' স্কুল তুলে দায় কমাতেই বেশি তৎপর।

মধ্যশিক্ষার বুনিয়াদটি বেশ মজবুত হওয়া উচিত, কেননা বেশিরভাগ বিদ্যার্থীর শিক্ষাজীবন এখানেই শেষ হয়, এর বেশি এগোয় না। কিন্তু এক্ষেত্রেও সরকারি অবহেলা প্রায় ক্ষমার অযোগ্য। গুণগত মান ক্রমনিম্নমুখী—অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীও চলনসই বাংলা লিখতে বা সাধারণ যোগবিয়োগ করতে পারছে না। সম্প্রতি নির্দেশ জারি হয়েছে বানান ভুল হলেও তার জন্য খেসারত দিতে হবে না—অর্থাৎ প্রকাশদক্ষতা মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। তাই গুণমানের প্রশ্ন তোলা থাক। অঙ্ক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী গ্রাফপেপার পাচ্ছে না। এটা খুব দামি নয়, কিন্তু পাওয়া যে যাবে না, সেটা আগেই বলা উচিত। মাধ্যমিক পরীক্ষায় তপন থানায় জীবনবিজ্ঞানের পরীক্ষায় ইতিহাসের প্রশ্ন আসছে। এর জন্য সরকার বা পর্ষদ সরাসরি দায়ী না হলেও, শৈথিল্য আকাশ থেকে পড়ে না, এটা সবাই জানে। স্কুলের ভেতর সকেট বোমা পাওয়া, মিড-ডে-মিলে আরশোলা থেকে টিকটিকি পরিবেশন, এগুলো কোনো ব্যতিক্রমী ঘটনা বলে আর মনে হচ্ছে না। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে গ্রামাঞ্চলের স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব। নানা দুর্নীতিতে এবং হয়তো সরকারের ব্যয়সংকোচের গোপন ইচ্ছায় যেখানে বহু বছর ধরে নিয়মিত নিয়োগই হচ্ছে না। এমতাবস্থায় 'উৎসশ্রী' নাম দিয়ে ঢালাও বদলির ব্যবস্থা করা নিতান্তই অবিবেচনাপ্রসূত, হঠকারী সিদ্ধান্ত। শিক্ষক যিনি ঘর থেকে অনেক দূরে রয়েছেন তাঁকে কাছে আনার সরকারি নীতি ভ্রান্ত নয় মোটেই। কিন্তু কখন, কীভাবে, কোন নীতি রূপায়ণ করলে সবচেয়ে কম ক্ষতি হয়, এটা চিন্তায় থাকা উচিত ছিল। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। পূর্বস্থলীর সাবিত্রী বালিকা বিদ্যালয়ের ২৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার ১৭ জনই বদলি হয়েছেন। এতে তাঁদের কিছু ব্যক্তিগত সুবিধা নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু ৮০০ ছাত্রীর স্কুলে স্থায়ী শিক্ষক কমে দাঁড়িয়েছে ৭জন। সংকট সামাল দিতে সেখানে করণিকও ক্লাস নিতে বাধ্য হচ্ছেন বলে খবরে প্রকাশ। বদলি নিতে ইচ্ছুকদের প্যানেল করে ধাপে ধাপে বদলি ও শূন্যপদ পূরণ করা যেত। তার জন্য প্রয়োজন ছিল পরিকল্পনা এবং শিক্ষকদের পরামর্শ। সরকারের তাতে অনীহা স্পষ্ট। শুধু করোনা নয়, এসব কারণেই ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ৪ লক্ষ কমে গেল। সরকারি ভাষ্যকাররা পার্সেন্টেজ কষবে, এটা তেমন কিছু উদ্বেগের নয় বলে যুক্তি সাজাবে। কিন্তু আরো ৪ লক্ষ সহনাগরিকের মানবসম্পদ উন্নয়নের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল, এ ক্ষতি পূরণীয় নয়। ইউনিফর্ম, সাইকেল, ট্যাব, স্কলারশিপের টাকা দেওয়া দোষের নয়। তবে এসব খয়রাতি তখনই সমর্থনীয় হয় যখন যে জন্য এসব দেওয়া সেই শিক্ষাটুকুও লভ্য হয়। কিন্তু সেদিকে নজর কম, কারণ শিক্ষা বিতরণে ভোট মেলার সুযোগ কম।

এদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রটি বড় বিচিত্র। নীতি বানানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্তরে, কাঁটছাঁট করে তার রূপায়ণ চলছে রাজ্যস্তরে। ফলে অবস্থা—না ঘরকা, না ঘাটকা। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হয়। কোভিড অতিমারির দশা কাটিয়ে পরিস্থিতি যখন একটু একটু করে স্বাভাবিক হচ্ছে, তখন ইউজিসি ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের মধ্যেই পিছিয়ে-পড়া সিমেস্টারগুলোর সময় শুধরে নিতে বলে। অর্থাৎ ২০২৩ সালের জুলাই মাস থেকে সিমেস্টার ঠিকঠাক হয়ে যাবার কথা। তার জন্য চলতি শিক্ষাবর্ষে Even সিমেস্টারের সময়-বরাদ্দ ছিল মোটামুটি পাঁচমাস—অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি থেকে জুন। কিন্তু বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষা শুরুই হয়নি। অর্থাৎ দ্বিতীয় সিমেস্টারের ক্লাস এপ্রিলের আগে শুরু করা যাবে না। সেক্ষেত্রে জুনের মধ্যে সেই সিমেস্টারের পঠনপাঠন ও পরীক্ষা শেষ করতে হলে বিদ্যার্থীদের ছ'মাসের পড়া-পরীক্ষা তিন মাসে শেষ করতে হবে যা অসম্ভব। কোভিডকালে অনলাইনে পাঠ-পরীক্ষা চলায়, অফলাইনে শিক্ষার্থীরা অভ্যস্তই হতে চাইছে না। বস্তুত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কন্যাশ্রী আর স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপের জন্যই বেশিরভাগ জন নাম লেখাচ্ছে। সরকারের লক্ষ্য যদি হয় শিক্ষার সম্প্রসারণ, উপভোক্তারা পড়ছে কিনা সেটাও দেখা দরকার। এ্যাডমিট কার্ডহীন পরীক্ষা, ঘনঘন সূচি পরিবর্তন, ভাষার ক্ষেত্রে টিক দেওয়া প্রশ্নের ছড়াছড়ি—সোজা কথায় পুরো ব্যবস্থাটাই ঘেঁটে গেছে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিছক নমিনির অভাবে বছরের পর বছর পরিচালন সমিতি গঠন করতে পারছে না। এগুলো শোধরানোর লক্ষণ নেই, কারণ বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন উপাচার্য নেই। আচার্যকে এবং ইউজিসির বিধিকে পাশ কাটিয়ে উপাচার্য নিয়োগ এবং তাঁদের আনুগত্য সুনিশ্চিত করতে স্বল্পমেয়াদী নিয়োগের দুর্বুদ্ধি সবকিছুকে প্রায় লাটে তুলে দিতে বসেছে। বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য বা কোনো আধিকারিক না থাকায় পরীক্ষা হতে পারছে না। অন্যত্র একই কারণে ফল প্রকাশ করা যাচ্ছে না। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী আচার্যের সঙ্গে সমঝোতায় আসার ব্যাপারে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু রফাসূত্রটিও উপাচার্যের মতো সম্মানজনক পদের পক্ষে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

পরিচালনার এই দুর্বলতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভর্তি, ডিগ্রিপ্রদান এবং শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি। অযোগ্যের নম্বর বাড়িয়ে তাকে মেধাতালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে শুধু তাই নয়, পথের কাঁটা সরাতে মেধাবী ৪০ পাওয়া প্রার্থীর নম্বর কমিয়ে করা হয়েছে ১০। অর্থের বিনিময়ে ভর্তি এমনই মান্যতা পেয়ে গেছে যে ডাক্তারি পড়ার ক্ষেত্রেও লোকে ঘুষ দিয়ে সিট কেনার রাস্তায় হাঁটতে শুরু করেছে। খবরে এটাও এসেছে যে বাস্তবে কলেজ নেই এমন ভুঁইফোঁড় বি.এড. কলেজের ডিগ্রি পাওয়া গেছে পয়সার বিনিময়ে। বিশ্ববিদ্যালয় সব জেনেও অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো চোখ বুজে থেকেছে। জনপ্রিয়তার লোভে খোদ মুখ্যমন্ত্রী বেশি বেশি মার্কস দেবার বন্দোবস্ত করার কৃতিত্ব নিয়েছেন। তিনি ভুলে গেছেন, মার্কস জ্ঞান পরিমাপের সূচকমাত্র। কেউ যদি বিষয়ের দুর্বলতা সত্ত্বেও সরকারি নীতির সৌজন্যে বেশি মার্কস পায় তাতে শুধু যোগ্যতরদের প্রতি অবিচারই হয় না, প্রাপকের মনেও 'যা সে নয়, সে তাই'—এরকম একটা ভুল ধারণা তৈরি হয়। এমন স্কুল আছে যেখানে ১০৬ বিদ্যার্থীর জন্য একজন মাত্র শিক্ষক। সর্বক্ষেত্রে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাতের বৈষম্য পুরো ব্যবস্থাটাকেই টলিয়ে দিচ্ছে।

আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থায় উপকরণের গুরুত্ব সবকালেই কম। চেয়ার বেঞ্চ না হলেও, ইউনিফর্ম না থাকলেও শিক্ষার রথটি চলমান থাকবে যদি শিক্ষক থাকে। আর সেটি চলতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে না যদি শিক্ষক শিক্ষাদানের উপযুক্ত অর্থাৎ সুশিক্ষক হন। এর কোনোটাই সরকারের অগ্রাধিকারে আছে বলে মালুম হচ্ছে না। ফলে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে। কোথাও 'লুজ

—এরপর চারের পাতায়

স্বপ্নভঙ্গের ট্রাজেডি

রমজান আলি

ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন :

২১ ফেব্রুয়ারি (৮ ফাল্গুন, ১৩৫৮) ঢাকায় শহিদদের আত্মত্যাগকে কেন্দ্র বাংলা ভাষা আন্দোলন, প্রতিবাদে

চতুর্থ কিস্তি

জমাটবদ্ধ রূপ লাভ করলো রাষ্ট্র আন্দোলনে। তার অনেক আগে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ঘোষিত বেন্টিঙ্কের পাশ্চাত্য ভাষা নীতির প্রতিক্রিয়ায় বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যপ্রীতি ও প্রসার প্রচেষ্টায় উৎসাহ উদ্দীপনার সূত্র ধরে 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা' স্থাপিত হয়েছিল। নাম দেখে মনে হতে পারে যে বাংলা ভাষা নিয়েই বেশি কথা বলবেন তাঁরা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিবাদী সভায় পরিণত হল। এক বছর আগে সরকারি ভাষা ফার্সির বদলে ইংরেজি হয়েছে। শতকরা কত ভাগ মানুষ তখন ইংরেজিতে কথা বলতেন? তেমন কোনো প্রতিবাদ হল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেই রাজত্বে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি আসতেই পারতো। ভাষা রয়েছে একটা দাবি আছে, তেমনটা তখন কেউ ভাবেননি। বাংলা গদ্য তখন সাধু চলিতে হালকা দ্বন্দ্বে ৩৫টা বছর কাটিয়ে ফেলেছে। বাংলা ভাষায় পাঠদান শুরু হয়েছে, ভাষা ভিত্তিক দাবী আরো হওয়া উচিত ছিল, হয়নি। তার একটা কারণ ধর্ম নিয়ে মাতামাতি। সেই সময়ে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা অবিভক্ত ভারতবর্ষে কম ছিল না।

মধুসূদনকে তাঁর পিতা আইনজীবী রাজনারায়ণ দত্ত সদ্যসদ্য কলকাতায় এসেছেন লেখাপড়া শেখানোর ইচ্ছায়। ইয়ং বেঙ্গলের ডিরোজিওর মতো ব্যক্তিত্বকে তখন অনেকেই 'গুরু' ধরেছেন। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে যখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বেরুচ্ছে তখন ইংরেজিতে কবিতা লেখা এবং ইংরেজি অধ্যাপকদের কাছে প্রশংসা প্রাপ্তি মধুসূদনের। মাত্র সতেরো বছর নাগাদ ১৮৪১ সালে, ২৮ মার্চ খিদিরপুরে বসে লিখে ফেললেন পরপর দুটো ইংরাজি কবিতা 'My Fond sweet blue-eyed maid'– 'They ask me why I fade and pine'। পরে পরে লিখলেন Captive lady– Vision of the past ইত্যাদি আরো অনেক কবিতা। তাঁর অন্তরে উচ্চাকাঙ্ক্ষার পটভূমি তৈরি হওয়াটাই স্বাভাবিক। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে শুরু করে সমকালীন অনেক মেধা যখন ন্যূনতম ইংরেজি জানেন না তখন মাইকেল ইংরেজিতে লিখতে পারছেন এবং সাহেব মাস্টারমশাইদের দ্বারা প্রশংসিত হচ্ছেন। এই অবস্থায় তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি অস্বাভাবিক নয়।

খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেও তিনি একজন নেটিভ, তাঁর মেধাকে বিদেশিরা গুরুত্ব দেবেন না সেটা তখন বুঝে উঠতে পারা সম্ভব ছিল না। বিদেশের মাটিতে পা দিয়ে এবং সেখানে থেকে মধু-মেধার স্বপ্নভঙ্গ ঘটে গেল। আক্ষেপে তখন তাঁর জেরবার অবস্থা। ঢাকায় ফিরে একটা বক্তৃতায় বলেছিলেন— ''আমার সম্বন্ধে আপনাদের আর যে কোন ভ্রমই হোউক, আমি সাহেব হইয়াছি এ ভ্রমটি হওয়া ভারী অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আমার বসিবার ও শয়ন করিবার ঘরে এক এক খানি আর্শি রাখিয়া দিয়াছি এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা ... বলবৎ হয় অমনি আর্শিতে মুখ দেখি। আরো, আমি শুদ্ধ বাঙ্গালি নহি, আমি বাঙ্গাল, আমার বাটি যশোহর।" তিনি তাঁর বঙ্গ-সত্তাকে কখনোই ভুলতে চাননি।

এদিকে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার নিয়ে দীনবন্ধু মিত্র যখন 'নীলদর্পণ' নাটক লিখছেন। চাষিরা জোটবদ্ধ হচ্ছে। চাষি ঘরের মেয়েদের উপর বলাৎকার হলে তোরাফকে দিয়ে সরাসরি নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন নাট্যকার দীনবন্ধু। সেইবছর ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে 'কবি-মাতৃভাষা' নামে লেখা এই

কবিতাটি পুনর্লিখিত হয়ে 'বঙ্গভাষা' নামে পরে চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে গ্রন্থভুক্ত হল। 'কবি-মাতৃভাষা' শুরুতে বলেছিলেন—'নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন/ অগণ্য; তা সবে আমি অবহেলা করি,' —একটু পাল্টে লিখলেন—'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;--/ তা সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,'। আত্মসমীক্ষাটা যেন একটু খুব বেড়ে গেল। সরাসরি স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা এই 'বঙ্গভাষা'। যে কবিতাটা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও আগ্রহী পাঠক ছাড়া বর্তমানে ইন্টারনেটে যুগে প্রায় ৮৫ হাজারের বেশি নেটিজন পড়েছেন বা চোখের দেখা দেখেছেন। প্রয়োজনে আরো অনেকেই দেখবেন।

মা, মাতৃভাষা আর মাতৃভূমি এই তিনটে শব্দই পরম শ্রদ্ধার। এগুলোর সঙ্গে আমাদের নাড়ীর যোগ। মধুসূদনের 'কাম ব্যাক' করে আসার ব্যাপারটা না থাকলে বাংলা সাহিত্যের অনেক কিছুই হয় অজানা থাকতো, না হয় আসতে আরো দেরি হত।

মাতৃভাষাকে ভালবেসে সতের শতকের কবি আব্দুল হাকিম বলেছেন—
'যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সবে কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ তেয়াগি কেন বিদেশ ন যায়।।'

এখন অবশ্য পেশার তাগিদে আধুনিক যুগে অনেকেই বাংলা মাতৃভাষিক পরিবেশ ছেড়ে বিদেশে গেছেন, কিন্তু তাঁর বাঙালি সত্তাকে সে কখনোই ভুলে যায়নি অথবা লাঞ্ছিত হতে দেয়নি।

আমরা অনেকেই বক্তৃতা ও বিভিন্ন লেখায় বলেছি যে, এই কবিতায় মধুসূদনের বাংলাভাষা প্রীতি জেগে উঠেছে। বাংলা ভাষিক পরিবেশে তিনি বড় হয়েছেন, শিকড় গেড়েছেন। কলকাতায় আসার আগে সেটাই ছিল তার বিচরণ ক্ষেত্র। নতুন করে মাতৃভাষার গুরুত্ব বুঝতে পারলেন। আপাত ব্যর্থতার পর সব মানুষেরই এই সচেতনতা ফিরে এলে আত্মার প্রকাশ অতি সহজেই ঘটে। তখন অনুভূতির স্তর আরো গভীর হয়—প্রতিভার ধনপতি নিজ আনন্দ-সদনে ভিখারীর নিরানন্দে দিন কাটাচ্ছিল। সেই একান্ত ব্যক্তিস্বর অতিক্রম করে 'বঙ্গভাষা'য় তা হয়ে উঠল—'মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে'। নিজেগারে 'অমূল্য রতন' তখন হয়ে উঠে বঙ্গ ভাণ্ডারে 'বিবিধ রতন'।

(চলবে)

বসন্ত উৎসব জেলাজুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৮ মার্চ : 'ফাগুন লেগেছে বনে বনে' 'খোল দ্বার খোল ওরে গৃহবাসি, লাগলো যে দোল।' সারা জেলা জুড়ে বসন্ত উৎসবে মাতলেন মানুষ। 'আয়না'-র উদ্যোগে টাউন হল ময়দানে বসন্ত উৎসব পালিত হয়। নৃত্য, গান, কবিতা ও সমবেত নৃত্য এবং গানের মধ্যে দিয়ে ৭-৮ মার্চ বসন্ত উৎসব পালন করেন বর্ধমানের শিল্পীরা। বর্ধমান শহরের ৩০টি নৃত্য সংস্থা আয়নার বসন্ত উৎসবে অংশগ্রহণ করে। ভেদাভেদ ভুলে সবার মন পলাশের মতো হয়ে উঠলো বসন্ত উৎসবে।

বর্ধমান কোর্ট কম্পাউন্ডের কাছে সিধুকানু পার্কে জেলা প্রশাসন ও জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর বসন্ত উৎসবের আয়োজন করে। নৃত্য, গানের মধ্যে দিয়ে বসন্ত উৎসব পালিত হয়। প্রশাসন থেকে সাংস্কৃতিক কর্মী ও সাংবাদিকরাও অংশ নেন।

—প্রথম পাতার পর

দামোদর বাঁচানোর দাবিতে

ভালবাসার বিস্তার ঘটিয়েই দামোদর বাঁচানোর পক্ষে সব মানুষকে জড়ো করতে হবে। মূল আলোচক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দেবাশিস ঘোষ দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি দিয়ে দামোদরের দুরবস্থা তুলে ধরেন। প্রস্তাবের সমর্থনে ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, সাংবাদিক সহ চারজন আলোচনা করেন। শুরুতেই তরুণ তরুণীদের নিয়ে গঠিত স্থানীয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী উড়ান-এর কোরিওগ্রাফি সকলের মনকে স্পর্শ করে, যেন মানুষ মানেই মানবতার জননী ও জনক একেকটি নদী বা নদ। সভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন দরফদার।

আলুর অভাবী বিক্রি রুখতে

—প্রথম পাতার পর

চাষিদের জন্য স্টোর ভাড়া কম করতে হবে, ভিন রাজ্যে অথবা বিদেশে আলু রপ্তানির জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। অবরোধের জেরে বেশ কিছুক্ষণ যানবাহন জট সৃষ্টি হয়। পড়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগামী ১৩ তারিখ ত্রি-পক্ষীয় বৈঠকের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

গতবছর হিমঘরে মজুত আলুর দাম না পেয়ে এবার নতুন উদ্যোমে চাষ করে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমানের আলুচাষিরা। মাঠে আলু তোলার ভরা মরশুম শুরু হয়েছে। কিন্তু আলুর দাম না থাকায় সিঁদুরে মেঘ দেখছেন চাষিরা। পূর্ব বর্ধমানের কমবেশি সব জায়গাতেই মাঠ থেকে আলু তোলার কাজ শুরু হয়েছে। জামালপুর থেকে রায়না, মেমারি থেকে আউশগ্রাম কিংবা কাটোয়া, কালনাতেও জোরকদমে চলছে জমি থেকে আলু তোলার কাজ। কিন্তু হাহাকার সব জায়গাতেই। আলুর দাম নেই।

গত বছর আবহাওয়ার খামখেয়ালি থাকলেও এবার ছিল একেবারে অনুকূল। তবুও আলুর ফলন কম। কাঠায় ৩ থেকে ৪ বস্তা আলু ফলেছে বলে জানা গেছে।

বিঘেতে আলুবীজ লাগে গড়ে ৪ বস্তা। এবার আলুর বীজের দাম ছিল বস্তা পিছু গড়ে ২০০০ টাকা থেকে ২২০০ টাকা। রাসায়নিক সারের জন্য বিঘে প্রতি গড়ে খরচ হয়েছে ৮ হাজার টাকা, শ্রমিক ৭ হাজার টাকা। এর বাইরে আছে জল, ট্রাক্টর ও কীটনাশক। সব নিয়ে এক বিঘে আলুচাষ করতে গড়ে খরচ হয়েছে ৩০ হাজার টাকা। আবার কোথাও কোথাও তা ছাড়িয়ে গেছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা কৃষক সভার সম্পাদক সমর ঘোষ বলেন, আলুর দাম না থাকায় চাষিদের মাথায় হাত। চাষিরা চাইছেন সরকার এগিয়ে আসুক।

—তিনের পাতার পর

সূচির শর্বরী—বর্ধমান তমসা

গার্ড' দিচ্ছে না বলে নজরদারদের শত্রু ভাবছে পরীক্ষার্থী, কোথাও ছাত্র স্কুলে এসে মাস্টারমশাইকে দেখে নেবার হুমকি দিচ্ছে। কোথাও যোগ্য শিক্ষকপদ প্রার্থীরা রাস্তায় বসে, তো কোথাও ১৭ মাস কর্মহীন ল্যাব এ্যাসিস্ট্যান্ট রাস্তায় ঝাড়ু দিয়ে প্রতিবাদ করছে। সরকার নির্লিপ্ত বা শীতঘুমে। এ সংকট আদৌ কাটবে কিনা বা কাটলে কবে কাটবে বলা শক্ত। কিন্তু যেটা স্পষ্ট তা হলো, সরকার পরিসংখ্যানের শাক দিয়ে অব্যবস্থার মাছ ঢাকতে যতটা উৎসাহী, শিক্ষার উন্নতি ঘটিয়ে সমাজকল্যাণে তার সিকিভাগও উৎসাহী নন। বড় কঠিন এ সময়!

পাখি-চোখ-১৮

রত্না রশীদ

হ্যাঁ, হচ্ছিলো ভ্রমণ কাহিনির কথা। তো, হেডমাস্টার মশাই বাপির সঙ্গে এটা সেটা গল্প করছেন দেশ-সমাজ এসব নিয়ে। মা এসে চা-জলখাবার দিয়ে আপ্যায়ন করলো হেডমাস্টার মশাইকে। তারপর বাপি আমাদের লেখাপড়ার প্রসঙ্গে এলো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাদের লেখপড়া ছাড়াও স্কুলে অন্যান্য ক্রিয়াকর্মে কী কেমন করছি আমরা তার খোঁজ নিলো।

চা-জলখাবার খাবার পর হাত ধুয়ে রুমালে হাত মুছতে মুছতে হেডমাস্টার মশাই এসে এক গাল হাসি সমেত পকেট থেকে পরীক্ষার একটা খাতা বের করে বাপির হাতে চালান করলেন—

—নিন্, আপনি নিজে পড়ে দেখুন।

—আমি পড়বো ছেলের খাতা? কেন খারাপ কিছু লিখেছে?

—খারাপ লিখলে তো আমি স্কুলেই সাবধান করতাম, শাসন করতাম। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, একে খারাপ বলবো, না পুরস্কার দেবো। ...কুশীলব আমার মেজোভাই অরবিন্দ কাঁপা কাঁপা পায়ে তটস্থ হয়ে সামনে এসে দাঁড়াল....মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে বিস্তর ভয় পেয়েছে। পারলে নিজেই কান ধরে কেঁদে ফেলে। চোখ মাটিতে গাঁথা, ঘাড় হেট। ও ভেবে নিয়েছে ওর শাস্তি হবেই হবে। তবে বাপি আমাদের কোনোদিন গায়ে হাত তোলেনি। হেডমাস্টার মশাইও না। তবু ও ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গেছিল। ছোটো বেলায় আমাদের জোরে কেউ বকেনি। এমন পরিস্থিতিও ছোট্ট জীবনটায় এই প্রথম। যেন আসামীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তার সামনে তার কৃতকর্মের ব্যাখ্যান হবে! মা-ও খানিক নতুন রকমের বিস্ময় নিয়ে বাপির পেছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল বলে দুজনেই একসঙ্গেই খাতাটা পড়লো। এরপর আমার পালা এলে দেখা গেল আমার মেজো ভাইয়ের পরীক্ষার খাতায় মনের কথা খুলে বলেছে।

প্রথমে সুন্দর হাতের লেখায় 'তোমার স্মরণীয় ভ্রমণ কাহিনি' বেশ দেড়পাতা জুড়ে লিখেছে। তখন আমদের শিক্ষাজীবনে (✓ টিক মারা) নম্বরী সিস্টেম শিক্ষাক্ষেত্রে ঢোকেনি, আবিষ্কারই হয়নি। একটা-দুটো বানান ভুল ছাড়া খুব সুন্দর লিখেছিল। কিন্তু লম্বা একটা দাগ দিয়ে পুরোটা কেটে দিয়ে মার্জিনে লিখেছে "এই লেখাটা রচনা বই থেকে মুখস্থ করে লিখেছি, তাই কেটে দিলাম কারণ এটা আমার স্মরণের ভ্রমণকাহিনি নয়। মিথ্যে কথা লিখে নম্বর নেওয়া উচিত নয়। আমি জীবনে দিল্লি যাইনি, তাজমহল, লালকেল্লা এসব মুখস্থ করে লিখবো কেন? আমি গেছি মামার বাড়ি সোনামুখী বাসে চেপে আর জ্যেঠুর বাড়ি চিত্তরঞ্জন ট্রেনে চেপে। সোনামুখীতে মনোহর দাসের মোচ্ছব হয় আর চিত্তরঞ্জনে রেল ইঞ্জিন তৈরি হয়। আমি আর কিছু জানি না। আমার বাপি বছরে তিনটে পাশ আর ছটা পিটিও পায়। সেগুলো আলমারিতে জমা করা থাকে। ছুটিও নেয় না, আর আমাদের কোথাও বেড়াতেও নিয়ে যায় না। আমার তাই সত্যিকারের ভ্রমণকাহিনি নেই।" আমি পড়তে পড়তেই দেখি বড়োরা হাসাহাসি করছে। বাপি একটু অপ্রস্তুত। হেডমাস্টার মশাই আমার মেজোভাইকে কাছে টেনে বললেন, ...ওরে তুই ভয় পাচ্ছিস কেন? তুই কোনো অন্যায় করিসনি। তোর মতো আমিও লিখতে পারতাম না রে। আমার উপায় থাকলে তোকে দশে কুড়ি দিতাম। কিন্তু সব মাস্টারমশাই তো দেবেন না। বিদ্যা মুখস্থ করলে কোনো দোষ হয় না। জীবনের সব কিছু কখনোই তোমার অভিজ্ঞতায় থাকবে না বাবা। আমরা সবাই বেশিরভাগটাই বই পড়ে লিখতে পারি।"—হেড মাস্টার মশাই পকেট থেকে এক ঠোঙা লজেন্স বার করে ওর হাতে দিয়ে বিদায় নিলেন।

সে বছর পুজোর ছুটিতে আমরা সপরিবারে দিল্লি, আগ্রা, সুরাট, রাজকোট বেড়িয়ে এলাম। এতোদিন বিদেশ ভ্রমণে সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়েছে আমার মেজোভাই অরবিন্দর। বড়ো বড়ো হোটেল বুক করে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যে রেখেছিল বাপি। কিন্তু হলে কি হবে, ও সব জায়গাতেই খেতে বসে খোঁজে—পোস্ত নেই? বাপি সারা শহর হন্যে হয়ে খুঁজেও বাঙালি হোটেল পেতো না। পেলেও শুধু পোস্ত কেউ বেচতো না। শেষ তক্ আমরা বড়ো হোটেলের স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে একটা বাঙালি গেস্ট হাউসে গিয়ে উঠলাম। সেখানে রোজ পোস্তর একটা আইটেম থাকতোই, হয় আলুপোস্ত, নয় পেঁয়াজ পোস্ত, নয়তো বড়া। ভাইয়ের আনন্দ ধরে না।

(চলবে)

সিপিআই(এম) দরদী প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ৬ মার্চ : সিপিআই(এম) গলসী ২ নং এরিয়া কমিটির বৃন্দাবনপুর শাখার দরদী কানাই ব্যানার্জি আজ ভোর ৪টায় প্রয়াত হয়েছেন। মরদেহে রক্ত পতাকা আচ্ছাদিত করে মাল্যদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন গলসী-২ এরিয়া কমিটির সদস্য সাইফুল হক, মোস্তাক হোসেন, জাহান আলী মোল্লা, শাখা সম্পাদক নিমাই ব্যানার্জি সহ শাখার অন্যান্য সদস্যগণ ও মানুষজন।

গলসীতে স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ৬ মার্চ : আজ বিকাল সাড়ে চারটা থেকে সিপিআই(এম) গলসী-১ এরিয়া কমিটির চাক তেঁতুল অঞ্চলের চাকতেতুল-৩ শাখার সদস্য ভূতনাথ ঘোষ-এর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অসংখ্য কর্মী দরদীরা এই সভায় হাজির হোন। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন সভার সভাপতি সদানন্দ অধিকারী। বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সম্পাদক সৈয়দ হোসেন, এরিয়া কমিটির সম্পাদক হারাধন ঘোষ, কমল সরকার ও ভূতনাথবাবুর ভাইপো।

তৈরি করেছেন আস্ত একটি রেলস্টেশন

—প্রথম পাতার পর

হ্যাঁ ১৯৭৪ সাল তখন পুলিশ অফিসার সুলতান সিং কাটোয়ার সাবডিভিশনাল পুলিশ অফিসার। ওই বছর এক বসন্তকালে এলাকার মানুষ বিশেষত এলাকার ছাত্র যুব শিবলুনের হরিপদ বিশ্বাস, অর্ধেন্দু মুখার্জি অম্বলগ্রামের যুব অরবিন্দ চ্যাটার্জী, সেনপাড়ার নাথুরাম ঘোষ,বেলুনের তারাদাস ভট্টাচার্য অনেকেই জোটবদ্ধ ভাবে ওইখানে গাড়ি থামানোর কর্মসূচি নিয়েছিলেন। যথারীতি তখনকার দিনে ব্যান্ডেল নলহাটি ট্রেনটিকে এই স্থানে থামানো হলো। ইঞ্জিনের সামনে কয়েক হাজার সাধারণ মানুষ। তাদের মুখে স্লোগান আমাদের দাবি মানতে হবে, নইলে চাকা বন্ধ হবে। মনে আছে অম্বলগ্রামের তরুণ যুব নেতা অরবিন্দ চ্যাটার্জী বলেছিলেন আমাদের দাবি—উত্তরে সমবেত রণধ্বনি : মানতে হবে নইলে চাকা, আবার ও জোরালো প্রত্যুত্তর বন্ধ হবে। আটকে পড়া রেলযাত্রীদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য এলাকা থেকে বস্তা বস্তা মুড়ি এবং দুধ সংগ্রহ করা হয়েছিল। হ্যাঁ, কোলের শিশুযাত্রীদের জন্য এই সুনিশ্চিত ব্যবস্থা। যথারীতি ব্যান্ডেল-নলহাটি ট্রেনটি ওইখানে থেমে আছে। সামনে ছেলেপিলে নিয়ে হাজির স্থানীয় মানুষ। কিছুক্ষণের মধ্যে খবর রটল সুলতান সিং আসছেন। অবরোধকারীদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল, বাড়তে থাকল আতঙ্কের মাত্রা। হ্যাঁ, ঠিক। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ অফিসার সুলতান সিং সহ কাটোয়া থেকে সংশ্লিষ্ট রেলকর্তারা অকুস্থলে পৌঁছে গেলেন। তারা তখন সাধারণ মানুষদের সামনে ইংরেজিতে হম্বিতম্বি করতে লাগলেন। এলাকার মানুষ কেউই তেমন ইংরেজি জানে না। এক জানতেন রেলের কর্মী শিবলুন গ্রামের পাঁচকড়ি ঘোষ। তিনিও এখন গ্রামে নেই। তাই মানুষজন রীতিমতো ফাঁপড়ে। ভীত সন্ত্রস্ত। কিন্তু পরিস্থিতি বোধ হয় নেতা তৈরি করে দেয়। তাই মুশকিল আসান করতে হঠাৎ যেন আবির্ভূত হলেন, শিবলুন স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা হাসপাতালের এক নার্সের স্বামী, যিনি এলাকায় মিত্রবাবু নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি তার সাধ্যমতো ইংরেজিতে রেল অফিসারদের বোঝাতে সমর্থ হলেন এই রেল অবরোধের যৌক্তিক হেতু। তারপর পরিস্থিতি শান্ত হল। সুলতান সিং ফিরে গেলেন। নিজ নিজ গ্রামে ফিরে গেলেন সমবেত মানুষজন।

এর কিছু দিনের মধ্যেই জানা গেল, শিবলুন হল্ট স্টেশন হবে। সেই মোতাবেক দিনে দুটি আপ এবং দুটি ডাউন ট্রেন থামবে। তখন আপ-এ সেই ব্যান্ডেল-নলহাটি আর ডাউনে বারহারোয়া-হাওড়া আর বিকালে সালার শিয়ালদা ডাউন আর কাটোয়া আজিমগঞ্জে লোকাল থামতে শুরু করল। টিকিটের দাম ৩৫ পয়সা। না, কোন স্থায়ী রেল কর্মী নয়, নতুন তৈরি হওয়া ছোট এক কুঠুরি গুমটির মতো ঘরে ঠিকাদার নিয়োগ করে টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা হলো। সেই ঠিকাদার হলেন শিবলুন গ্রামের বেকার যুবক সনৎ বিশ্বাস। তারপর দেখতে দেখতে সেই স্টেশন ৫০ বছর পার করল। এলাকার মানুষ নীরবে দেখলেন আস্তে আস্তে দিনের প্রায় সব লোকাল ট্রেন এই হল্ট স্টেশনে থামতে বাধ্য হল। শুধুমাত্র যাত্রীদের সংখ্যা এবং দাবি বাড়ার কারণে।

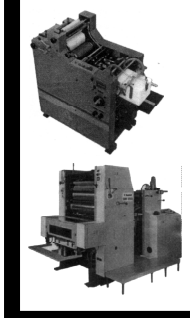
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড্ কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা